বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ বাংলাদেশের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা

বণিক গৌর সুন্দর*

Foreign Aid and Economic Development: The experiences of last three decades in Bangladesh

Abstract

In the last three decades (1971/72 – 1999/00), Bangladesh received US$ 3634 crore as foreign aid. The question is how far this large amount of foreign aid has contributed to economic development of Bangladesh. This study has made an attempt to analyse the trends of different macro variables like growth, savings, investment, poverty, export, import, etc. over the last few years. The study also tried to relate whether the volume of foreign aid received in this period had any impact on the trends of the above macro variables. It has found very tenuous relationship between these macro variables and the volume of foreign aid. Therefore, the notion that foreign aid has contributed in the economic development process of Bangladesh remains questionable. In the study, it is found that in recent years, the economic growth has increased and the national savings ratio to GDP has also increased. Developments along these two macro variables are expected to reduce the country's dependence on foreign aid.

১.০ ভূমিকা

১.১ গত তিন দশকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য এসেছে (১৯৭১/৭২-১৯৯৯/২০০০ পর্যন্ত মোট প্রায় ৩৬৩৪ কোটি মার্কিন ডলার, সারণী-১)। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতখানি ভূমিকা রেখেছে সেটি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। স্বাধীনতার পর থেকে এই বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পেছনে প্রত্যাশা ছিল যে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে, সঞ্চয় বাড়িয়ে বিনিয়োগ ঘটাবে এবং অবশেষে বাংলাদেশের পরনির্ভরতা দূরীভূত হবে। অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "Development as Freedom" এর মুখবন্ধে বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উন্নয়ন মানে পরাধীনতার অবসান।

১.২ গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন ভূমিকা রেখেছে সেটি বুঝতে হলে প্রথমেই বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে এবং তার কাঠামোগত পতিবর্তন নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদেশিক ঋণের সুবিদাভোগী কারা তা চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাম্প্রতিককালে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো চলক যেমন প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানী এবং দারিদ্র বিমোচন পরিস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ সাহায্য আসলে কতখানি প্রয়োজন তা মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.০ বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ

২.১বৈদেশিক সাহায্য কাকে বলে ?

২.১.১ আন্তর্জাতিকভাবে 'বৈদেশিক সাহায্য' কে অর্থনৈতিক সাহায্য বলা হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব পুঁজি বাজারে প্রচলিত ঋণদান ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত নমনীয় শর্তে দাতা দেশ কর্তৃক গ্রহীতা দেশে সম্পদ হস্তান্তরকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। জাতিসংঘের ব্যাখ্যা মতে বৈদেশিক সাহায্য শুধুমাত্র কোন সরকার বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি অনুদান বা দীর্ঘ মেয়াদী বেসামরিক ঋণকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে ।

২.১.২ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) এর উন্নয়ন সহায়তা কমিটি (DAC) এবং জাতিসংঘ বৈদেশিক সাহায্যের উপাদান হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে ঃ

ক. কোন সাহায্য অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারিভাবে) প্রদান ও গ্রহণ করতে হবে । খ. সাহায্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে গ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন । সেজন্য পুঁজি বাজারের তুলনায় নমনীয় শর্তাধীনে ঋণ প্রদান করা হবে । গ. সামরি সাহায্য কখনো অর্থনৈতিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না । ঘ. খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরী সাহায্য অর্থনৈতিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঙ. তাৎক্ষণিক জরুরী সাহায্য ও ত্রাণ অর্থনৈতিক সাহায্যের আওতাভুক্ত হবে ।

২.১.৩. বৈদেশিক সাহায্যের অবয়ব অনুসারে একে তিনভাগে ভাগ করা হয় - খাদ্য সাহায্য, দ্রব্য সাহায্য এবং প্রকল্প সাহায্য । সাহায্যের ব্যবহার অনুযায়ী একে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য এবং সাহায্যের বাণিজ্যিক দাম অনুসারে একে অনুদান (Grant) ও ঋণ (Loan) হিসেবে বিভক্ত করা হয় । সুদের হার অনুযায়ী ঋণ কঠিন (hard) অথবা কোমল (soft) হতে পারে। সাহায্যের শর্ত অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য শর্তহীন (untied) ও শর্তযুক্ত (tied) হতে পারে ।

২.১.৪ শর্তযুক্ত সাহায্য হচ্ছে সেই ধরণের সাহায্য যার প্রাপ্তি দাতার বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ইচ্ছাপূরণের উপর নির্ভর করতে পারে । শর্তযুক্ত সাহায্যের মধ্যে দাতার বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক শর্তও থাকতে পারে, যেমন, প্রাপ্ত সাহায্য

দ্বারা শুধুমাত্র দাতা দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী কিনতে হবে, প্রাপ্ত সাহায্য ব্যবহারের জন্য দাতা দেশের বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে ইত্যাদি ।

২.১.৫ বৈদেশিক সাহায্যের চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য দ্বি-পাক্ষিক অথবা বহু-পাক্ষিক হতে পারে। সরাসরি দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যে সম্পদ দাতা দেশ থেকে গ্রহীতা দেশে হস্তান্তরিত হয় তাকে দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য (bilateral aid) বলে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা গ্রহীতা দেশে যে সাহায্য দেয় সেগুলো বহু-পাক্ষিক সাহায্য (multilateral aid) । কারণ, এসব সংস্থা অনেকগুলো দেশের প্রতিনিধিত্ব করে ।

২.২ দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ

২.২.১ দাতা দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র পরার্থপরতা থেকেই সাহায্য দিতে উৎসাহিত হয় না । তাদের স্বার্থপরতাও অনেকাংশে এর সাথে জড়িত । ষাট-এর দশকের পর থেকে উন্নত বিশ্বে প্রবৃদ্ধির হার কমে এসেছে চাহিদার স্বল্পতাহেতু । অনুন্নত বিশ্বের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে উন্নত বিশ্বের দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার কথা । এ ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যেও উন্নত বিশ্ব অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে থাকে ।

২.২.২ দাতা দেশসমূহের ঋণ বা সাহায্য প্রদানের পেছনে গ্রহীতা দেশসমূহের উপর দাতা দেশসমূহের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান । আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে 'নব্য উপনিবেশবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহের পতনের পর ষাট দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় একে একে নতুন নতুন অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে । বেশীর ভাগ দেশই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল । কিন্তু ভগ্নদশাগ্রস্ত অর্থনীতি ও পংগু সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত উন্নয়নের প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যুদস্ত হয় । এ সুযোগে পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যারা উপনিবেশ শোষণের মাধ্যমে ধনী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে- সুযোগ বুঝে নতুন কায়দায় এই সকল দরিদ্র দেশে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালায় । যা অর্থনৈতিক সাহায্যের অবয়বে তাদের নগ্ন পরিকল্পনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে ।

৩.০ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তন

৩.১ স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত আমরা সরকারিভাবে প্রায় ৩৬৩৪ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পেয়েছি (সারণী-১) । তাছাড়া গত দশ বছরে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের কাছ থেকে বৈদেশিক অনুদান এসেছে আরও ৭৫৬৭ কোটি টাকা (সারণী-৩)। ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার সেটা ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৯ কোটি ডলারে, অর্থাৎ তিরিশ বছরে বৈদেশিক সাহায্য প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ১
বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(কোটি মার্কিন ডলারে)

বছর	অংগীকার			ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭১/৭২	৫১.৩	৯.৮	৬১.১	২৪.৫	২.৬	২৭.১
১৯৭২/৭৩	৪৮.৩	৩৯.৫	৮৭.৮	৪৮.৬	৬.৫	৫৫.১
১৯৭৩/৭৪	১০.৭	৪৪.৮	৫৫.৫	২১.৮	২৪.৩	৪৬.১
১৯৭৪/৭৫	৩৪.৫	৯২.১	১২৬.৬	৩৭.৫	৫২.৬	৯০.১
১৯৭৫/৭৬	৩৮.০	৫৭.৮	৯৫.৮	২৩.৪	৫৬.৭	৮০.১
১৯৭৬/৭৭	৪০.০	৩২.৬	৭২.৬	২৫.৬	২৭.৯	৫৩.৫
১৯৭৭/৭৮	৪৩.৩	৭১.৪	১১৪.৭	৩৯.৩	৪৪.১	৮৩.৪
১৯৭৮/৭৯	৯৩.৬	৮২.৪	১৭৬.০	৫০.২	৫২.৮	১০৩.০
১৯৭৯/৮০	৪৮.৫	৬৬.৮	১১৫.৩	৬৫.০	৫৭.৩	১২২.৩
১৯৮০/৮১	৫৫.০	১০০.৯	১৫৫.৯	৫৯.৩	৫৫.৩	১১৪.৬
১৯৮১/৮২	৮০.৫	১১.৭	১৯২.২	৬৫.৪	৫৮.৬	১২৪.০
১৯৮২/৮৩	৮৩.৭	৬৮.৫	১৫২.২	৫৮.৭	৫৯.০	১১৭.৭
১৯৮৩/৮৪	৮৫.৯	৮৩.৬	১৯৯.৫	৭৩.৩	৫৩.৫	১২৬.৮
১৯৮৪/৮৫	৮৭.৫	১১০.৫	১৯৮.০	৭০.৩	৫৬.৬	১২৬.৯
১৯৮৫/৮৬	৮৭.৪	৭৮.৭	১৬৬.১	৫৪.৬	৭৬.০	১৩০.৬
১৯৮৬/৮৭	৮৯.৪	৭০.৯	১৬০.৩	৬৬.১	৯৩.৪	১৫৯.৫
১৯৮৭/৮৮	৮৮.১	৬৪.৮	১৫২.৯	৮২.৩	৮১.৭	১৬৪.০
১৯৮৮/৮৯	৬৬.১	১২১.২	১৮৭.৩	৬৭.৩	৯৯.৫	১৬৬.৮
১৯৮৯/৯০	৮৮.৫	১২৯.০	২১৭.৫	৭৬.৬	১০৪.৪	১৮১.০
১৯৯০/৯১	৪৮.৫	৮৮.৫	১৩৭.০	৮৩.১	৯০.১	১৭৩.২
১৯৯১/৯২	১১৪.০	৭৭.৫	১৯১.৫	৮১.৭	৭৯.৪	১৬১.১
১৯৯২/৯৩	৭৩.৪	৫৪.০	১২৭.৪	৮১.৮	৮৫.৭	১৬৭.৫
১৯৯৩/৯৪	৪৬.৪	১৯৪.৬	২৪১.০	৭১.০	৮৪.৯	১৫৫.৯
১৯৯৪/৯৫	৮৬.১	৭৫.১	১৬১.২	৮৯.০	৮৪.৯	১৭৩.৯
১৯৯৫/৯৬	৮৬.৪	৪১.৬	১২৮.০	৬৭.৭	৭৬.৬	১৪৪.৩
১৯৯৬/৯৭	৮৪.২	৮১.৯	১৬৬.১	৭৩.৬	৭৪.৫	১৪৮.১
১৯৯৭/৯৮	৫৮.৫	১২০.৬	১৭৯.১	৫০.৩	৭৪.৮	১২৫.১
১৯৯৮/৯৯	৮৬.২	১৭৮.৭	২৬৪.৯	৬৬.৯	৮৬.৭	১৫৩.৬
১৯৯৯/০০	৬১.৯	৮৫.৬	১৪৭.৫	৭২.৬	৮৬.২	১৫৮.৮
সর্বমোট	১৯৬৫.৯	২৪৩৫.১	৪৪০১.০	১৭৪৭.৫	১৮৮৬.৬	৩৬৩৪.১
শতকরা হার	৪৫	৫৫	১০০	৪৮	৫২	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৭৩ ।

৩.২ সারণী ২-এ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়িত চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অংশ দেখানো হয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়কালে দেখা যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তেমন একটা বাড়েনি । কিন্তু পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা দিন দিনই বেড়েছে (সারণী -২, সারি ২ এবং ৪)। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ব্যর্থতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি থেকেই আমাদের সাহায্য নির্ভরতা বেড়েছে । ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪০%। প্রকৃতপক্ষে সেটা বেড়ে হয় ৭২% । ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭৪% । প্রকৃতপক্ষে সেটা বেড়ে হয় ৭৭% । ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৬৩.৫%, প্রকৃত পক্ষে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০% এ । অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে ৯০ পর্যন্ত পরনির্ভরতা ক্রমশঃ বেড়েছে । ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৪.২৭%, প্রকৃত পক্ষে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭.৬৪% এ। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ৯০ পরবর্তী বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কমেছে। সারণী -১ থেকেও এটি স্পষ্ট যে, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ গত প্রায় ত্রিশ বছরে ছয় গুণ বৃদ্ধি পেলেও গত দশ বছরে তা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ১৯৮৯-৯০ সনে বাংলাদেশ ১৮১ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ করেছে। যেখানে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে এসে পৌছেছে ১৫৮.৮ কোটি ডলারে।

সারণী-২
বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় পরিকল্পনা আয়তন, প্রবৃদ্ধির হার এবং বৈদেশিক সাহায্য

(কোটি টাকায়, প্রতিটি পরিকল্পনার ভিত্তি বছরের মূল্যে)

		FFYP ৭৩-৭৮	প্রকৃত	TYP ৭৮-৮০	প্রকৃত	SFYP ৮০-৮৫	প্রকৃত	TFYP ৮৫-৯০	প্রকৃত	FFYP ৯০-৯৫	প্রকৃত
১।	পরিকল্পনা আয়তন	৪৪৫৫	২০৭৪ (৪৭)	৩৮৬১	৩৮৫৯	১৭২০০	১৫৫৯৭ (৮৯)	৩৮৬০০	২৭০১১ (৭০)	৬২০০০	৫৯৮৪৮ (৯৬)
২।	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.৫	৪.০	৫.৬	৩.৫	৫.৪	৩.৮	৫.৪	৩.৮	৫.০	৪.১৫
৩।	মোট বৈদেশিক সাহায্য	১৭৮২	১৪৯১	২৮৫৭	২৫৮১	১৬২৫৪	১৩৬১৬	২৪৮৯৭	২৪৪১২	৮৩৩৮*	৭৫১৪*
৪।	পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অংশ (%)	৪০	৭২	৭৪	৭৭	৬৩.৫	৮৯	৬৪.৫	৯০	৪৪.২৭	৪৭.৬৪

উৎস ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, পরিকল্পনা কমিশন, বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার বুঝানো হয়েছে,* মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

সারণী-৩

বাংলাদেশে এনজিও-দের উদ্দেশ্যে বিদেশী অনুদান প্রবাহঃ ১৯৯০-১৯৯৯

সময়কাল (অর্থ বছর)	মোট এনজিও	মোট প্রকল্প	কোটি টাকা	কোটি ডলার
১৯৮৯-৯০	৩৮২	৮	২১.৭	০.৫
১৯৯০-৯১	৪৯৪	৪৬৪	৪২৬.৪	১০.৬
১৯৯১-৯২	৫৩৪	৫৪৯	৪৮৬.৫	১২.১
১৯৯২-৯৩	৭২৫	৬২৬	৭৮২.৮	১৯.৫
১৯৯৩-৯৪	৮০৭	৫৮১	৬৮৪.০	১৭.১
১৯৯৪-৯৫	৯১৯	৫৭৯	৮৩৮.০	২০.৯
১৯৯৫-৯৬	১০১৪	৭০২	১০৩৭.২	২৫.৯
১৯৯৬-৯৭	১১৩২	৭৪৬	১০৪১.০	২৫.০
১৯৯৭-৯৮	১২৩৯	৭০৫	৯৩৬.০	২০.৬
১৯৯৮-৯৯	১৩৬১	১০৪৫	১৩১২.৮	২৭.৩
মোট			৭৫৬৬.৭	১৭৯.৯

উৎস ঃ এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, প্রধান মন্ত্রীর অফিস (১ ডলার=৪৫.২৫ টাকা) ।

৩.৩ বাংলাদেশে গত প্রায় তিরিশ বছরে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহে কিছু কাঠামোগত রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ঋণ-অনুদান কাঠামোতে পরিবর্তন

সারণী-৪ থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের ঋণ-অনুদান কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। গত তিরিশ বছরের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৫২ শতাংশ ছিল ঋণ ও ৪৮ শতাংশ ছিল অনুদান। তুলনামূলক হিসেবে উত্তরোত্তর ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি ও অনুদানের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রাপ্তিতে যেখানে ১৯৭১/৭২ সনে ঋণের অংশ ছিল প্রায় ১০ ভাগ সেটা ১৯৯৮/৯৯ সনে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দাতা গোষ্ঠী বৈদেশিক সাহায্যের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুদান দিয়ে শুরু করলেও উত্তরোত্তর আমাদেরকে অধিকহারে ঋণের চক্রে আবদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয় উত্তরোত্তর ঐ ঋণজাল হয়েছে অধিকতর শর্ত জালের ঋণ (tied loan) । আর এই শর্ত জালের ঋণ আমাদের দেশে নির্ভরশীল ভাড়াটে অর্থনীতির একটা কাঠামো সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

সারণী-৪

বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামোগত পরিবর্তন (শতকরা ভাগে)

সাল	খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	ঋণ	অনুদান	বহুমাত্রিক	দ্বিপাক্ষিক
১৯৭১.৭২	৪৭.৯	৫০.৮	১.৩	৯.৫	৯০.৫	১৪.৩	৮৫.৭
১৯৭২.৭৩	৩৩.১	৫২.৪	১৪.৫	১১.৮	৮৮.২	৩৬.৭	৬৩.৩
১৯৭১.৭৩	৩৮.০	৫১.৯	১০.২	১১.০	৮৯.০	২৯.৩	৭০.৭
১৯৭৩.৭৪	৪৯.৬	২৩.৪	২৭.০	৫২.৬	৪৭.৪	১৯.৪	৮০.৬
১৯৭৪.৭৫	৪২.৪	৪১.৭	১৫.৯	৩৮.৪	৪১.৬	২৪.৫	৭৫.৫
১৯৭৫.৭৬	৩৯.২	৪৫.২	১৫.৭	৭০.৮	২৯.২	২৮.৬	৭১.৪

সাল	খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	ঋণ	অনুদান	বহুমাত্রিক	দ্বিপাক্ষিক
১৯৭৬.৭৭	২২.৭	৪৭.৬	২৯.৭	৫২.২	৪৭.৮	২৭.৫	৭২.৫
১৯৭৭.৭৮	২১.৩	৪৫.৬	৩৩.০	৫২.৯	২৭.১	২১.৮	৭৮.২
১৯৭৩.৭৮	৩৪.৭	৪১.৯	২৩.৪	৫৮.২	২১.৮	২৪.৬	৮৫.৪
১৯৭৮.৭৯	১৭.৪	৪৬.৯	৩৫.৮	৫১.৩	৪৮.৭	২৯.৫	৭০.৫
১৯৭৯.৮০	৩০.৬	৩০.৯	৩৮.৪	৪৬.৮	৫৩.২	২৭.৩	৭২.৭
১৯৭৮.৮০	২৪.৬	৩৮.২	৩৭.২	৪০.৮	৫১.২	২৮.৩	৭১.৭
১৯৮০.৮১	১৬.৯	৩৪.২	৪৮.৮	৪৮.২	৫১.৮	২৭.৯	৭২.১
১৯৮১.৮২	১৮.৬	৩৩.৯	৪৭.৫	৪৭.৩	৫২.৭	৩২.২	৬৭.৮
১৯৮২.৮৩	২১.৭	৩৮.৪	৩৯.৯	৫০.১	৪৯.৯	৩২.৫	৬৭.৫
১৯৮৩.৮৪	২১.৮	৩৪.৬	৪৩.৬	৪২.১	৫৭.৯	৩৫.৭	৬৪.৩
১৯৮৪.৮৫	১৯.৫	৩৪.০	৪৬.৫	৪৪.৬	৫৫.৪	৪৩.২	৫৬.৮
১৯৮০.৮৫	১৯.৭	৩৫.০	৪৫.৩	৪৬.৪	৫৩.৬	৩৪.৫	৬৫.৫
১৯৮৫.৮৬	১৫.৫	৩০.১	৫৪.৪	৫৮.২	৪১.৮	৫২.১	৪৭.৯
১৯৮৬.৮৭	১৪.১	২৫.২	৬০.৬	৫৮.৫	৪১.৫	৩৩.৯	৬৬.১
১৯৮৭.৮৮	১৮.৩	৩১.১	৫০.৬	৪৯.৮	৫০.২	৪৪.৯	৫৫.১
১৯৮৮.৮৯	১৩.৬	৩২.২	৫৪.২	৫৯.৭	৪০.৩	৪৬.৪	৫৩.৬
১৯৮৯.৯০	১০.৪	২৫.২	৬৪.৪	৫৭.৭	৪২.৩	৪৯.৬	৫০.৪
১৯৮৫.৯০	১৪.৩	২৮.৭	৫৭.১	৫৬.৭	৪৩.৩	৪৫.৩	৫৪.৭
১৯৯০.৯১	১৫.৫	২৩.৬	৬০.৯	৫২.০	৪৮.০	৬০.৭	৩৯.৩
১৯৯১.৯২	১৫.০	২৪.০	৬১.১	৪৯.৩	৫০.৭	৫৩.৪	৪৬.৬
১৯৯২.৯৩	৭.২	২২.২	৭০.৬	৫১.১	৪৮.৯	৪৫.৩	৫৪.৭
১৯৯৩.৯৪	৭.৬	২৯.০	৬৩.৫	৫৪.৪	৪৫.৬	৫৩.১	৪৬.৯
১৯৯৪.৯৫	৭.৯	১৯.১	৭৩.০	৪৮.৮	৫১.২	৪৭.২	৫২.৮
১৯৯৫.৯৬	৯.৬	১৫.৯	৭৪.৬	৫৩.১	৪৬.৯	৪৭.৬	৫২.৪
১৯৯০.৯৬	১০.৫	২২.৩	৬৭.২	৫১.৪	৪৮.৬	৫১.৩	৪৮.৭
১৯৯৬.৯৭	৬.৮	১৭.৮	৭৫.৪	৫০.৩	৪৯.৭	৫১.৬	৪৮.৪
১৯৯৭.৯৮	৭.৪	৯.৬	৮৩.০	৫৯.৮	৪০.২	৬১.০	৩৯.০
১৯৯৮.৯৯	১১.৫	২১.১	৬৭.৪	৫৬.৪	৪৩.৬	৫৭.৪	৪২.৬
১৯৯৬.৯৯	৮.৭	৯.০	৭৪.৮	৫৫.৩	৪৪.৭	৫৬.৪	৪৩.৬
মোট	১৬.৮	২৮.১	৫৪.২	৫১.৮	৪৮.২	৪২.৯	৫৭.১

উৎস ঃ Flow of External Resources into Bangladesh, ERD, ২০০০, পৃঃ ৩৮।

খ) ঋণ-অনুদানে খাতওয়ারী পরিবর্তন

বেশ দীর্ঘকালব্যাপী মোট বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্প খাতের বিপরীতে খাদ্য ও পণ্য খাতের আধিক্য থাকলেও উত্তরোত্তর প্রকল্প খাতই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন ১৯৭২/৭৩ সনে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৫ শতাংশই ছিল খাদ্য ও পণ্য খাতে। খাদ্য খাতে ছিল ৩৩% ও পণ্য খাতে ছিল ৫২%। পরবর্তীতে এ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে (সারণী-৪) । গত ত্রিশ বছরের প্রবণতা সেটাই নির্দেশ করে। যেমন ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৩ ভাগই এসেছে প্রকল্প খাতে। প্রকল্প-জালের বেষ্টনী যত শক্তভাবে কাজ করে গ্রহীতা দেশ থেকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অংশ তত অধিক হারে দাতা দেশে স্থানান্তরিত হয় ।

গ) সাহায্যের উৎসগত পরিবর্তন

উৎসগত দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক দাতার (bilateral donors) বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা (multilateral donors) প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিপাক্ষিক দাতার বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত অধিক অনড় ও পারঙ্গম। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত শর্ত জালের কর্মকৌশল অধিকতর ফলপ্রদ করার স্বার্থে উত্তরোত্তর দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের দায় দেনার বোঝাঃ ১৯৭১/৭২ - ১৯৯৯/২০০০

(কোটি মার্কিন ডলারে)

সাল	মোট প্রদেয়	ঋণ পরিশোধ			অপরিশোধিত ঋণ
		কিস্তি (মূল)	সুদ	মোট	
১৯৭১-৭২	২.৬				২.৬
১৯৭২-৭৩	৬.৫				৬.৫
১৯৭৩-৭৪	২৪.৩	০.৯	০.৯	১.৮	৩২.৪
১৯৭৪-৭৫	৫২.৬	৫.৮	১.৩	৭.১	৭৯.৩
১৯৭৫-৭৬	৫৬.৭	৩.৬	২.০	৫.৬	১৩২.৪
১৯৭৬-৭৭	২৭.৯	২.২	২.৮	৫.০	১৫৮.০
১৯৭৭-৭৮	৪৪.১	৩.৪	৩.১	৬.৫	২৫২.১
১৯৭৮-৭৯	৫২.৮	৫.০	৩.৯	৮.৯	২৯৩.৪
১৯৭৯-৮০	৫৭.৩	৭.০	৪.২	১০.৮	৩০০.৯
১৯৮০-৮১	৫৫.৩	৪.৪	৪.১	৮.৫	৩৫১.২
১৯৮১-৮২	৫৮.৬	৪.৫	৪.৭	৯.২	৩৯১.৬
১৯৮২.৮৩	৫৯.০	৮.৫	৫.১	১৩.৬	৪৩৫.২
১৯৮৩-৮৪	৫৩.৫	৭.১	৫.৮	১২.৮	৪৮১.০
১৯৮৪-৮৫	৫৬.৬	১০.৬	৬.৪	১৭.০	৫২৬.৮
১৯৮৫-৮৬	৭৬.০	১১.১	৭.৩	১৮.৪	৬১৪.০
১৯৮৬-৮৭	৯৩.৪	১৫.২	৮.১	২৩.৩	৭৫২.৮
১৯৮৭-৮৮	৮১.৭	১৬.৬	১২.৩	২৮.৯	৮৬৭.৫
১৯৮৮-৮৯	৯৯.৫	১৭.০	১২.৪	২৯.৪	৮৯২.৩
১৯৮৯-৯০	১০৪.৪	১৮.৬	১১.৬	৩০.২	৯৮০.৯
১৯৯০-৯১	৯৫.১	১৯.৭	১২.০	৩১.৭	১১৯৩.৪
১৯৯১-৯২	৭৯.৪	২১.০	১২.৭	৩৩.৭	১২৩৭.১
১৯৯২-৯৩	৮৫.৭	২৩.৯	১৩.৫	৩৭.৪	১২৭৪.৮
১৯৯৩-৯৪	৮৪.৯	২৬.৩	১৩.৯	৪০.২	১৪৫৬.২
১৯৯৪-৯৫	৮৪.৯	৩১.৪	১৫.৪	৪৬.৮	১৫৯৪.৭
১৯৯৫-৯৬	৭৬.৬	৩১.৭	১৫.৩	৪৬.৯	১৪৪৫.৪
১৯৯৬-৯৭	৭৪.৫	৩১.৬	১৪.৭	৪৬.৩	১৪৩৭.৩
১৯৯৭-৯৮	৭০.৬	৩০.৭	১৩.৭	৪৪.৪	১৩৪১.৮
১৯৯৮-৯৯	৮৬.৭	৩৭.০	১৬.৫	৫৩.৫	১৪৩৫.৪
১৯৯৯-২০০০	৮৬.২	৪৪.৭	১৭.২	৬১.৯	১৬২১.১
মোট	১৮৮৬.৬	৪৩৯.৩	২৪১.০	৬৮০.৩	

উৎস ঃ Flow of External Resource into Bangladesh, ERD ২০০০ (পৃঃ ১২০)

৩.৪ ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আমাদের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি করেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ঋণের পরিমাণ, গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়া এবং প্রতিকূল বিনিময় হার ক্রমান্বয়ে আমাদের পরিশোধিতব্য ঋণের (debt service payment) বোঝা বৃদ্ধি করেছে। যেমন, ১৯৭২/৭৩ সনে আমাদের মোট অপরিশোধিত ঋণের বোঝা ছিল ৬.৫ কোটি ডলার আর ১৯৯৯/২০০০ সনে তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১৬২১ কোটি ডলারে (সারণী-৫) । ঋণের কিস্তি ও সুদ প্রদানের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪-এর ১.৮ কোটি ডলার থেকে ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬২ কোটি ডলারে। গত প্রায় তিরিশ বছরে (১৯৭১/৭২-১৯৯৯/২০০০) ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৬৮০ কোটি ডলারের বেশী।

৪.০ বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

৪.১ গত প্রায় ত্রিশ বছরে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮-৯৯) সরকারিভাবে প্রাপ্ত ৩৪৭৫ কোটি মার্কিন ডলারের (প্রায় ১,৮০,০০০ কোটি টাকা) বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা এ বিষয়ে হিসাব নিকাশ করা দুরুহ। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প দলিলের বিশ্লেষণ এবং বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কিছু অনুমান নির্ভর হিসাব করার প্রয়াস নেয়া হয়েছিল । বিভিন্ন ধরনের অনুমান নির্ভরতার কারণে হিসাবটি অত্যন্ত মোটা দাগের হলেও সেটা যথেষ্ট মাত্রায় মূল প্রবণতা নির্দেশ করতে সক্ষম । এক হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশে আয়ের অসম বন্টন ত্বরান্বিত করেছে এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে দেশী ও বিদেশী কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে । এই হিসাবে (সারণী-৬) দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এজেন্ট ও পরামর্শকরা সম্মিলিতভাবে মোট সাহায্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা নিজেদের অনুকূলে প্রযোজিত করেছেন।

সারণী-৬

গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮/৯৯) বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিদাভোগী শ্রেণী সমূহ

সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ	মোট সুবিধার পরিমাণ (কোটি টাকা)	সুবিধার শতকরা হার
বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী	২৩,৪০০	১৩
বিদেশী পরামর্শক	২১,৬০০	১২
দেশের কমিশন এজেন্ট	১০,৮০০	৬
আমলা-রাজনীতিবিদ	১২,৬০০	৭
নির্মাণ ঠিকাদার	২৩,৪০০	১৩
অন্যান্য ধনী ব্যক্তি (শহর ও গ্রাম)	৩৬০০০	২০
শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে নিয়োজিত শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গ্রামীণ ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি	৪৫,০০০	২৫
মোট	১৮০,০০০	১০০

উৎস ঃ বারকাত, আবুল (২০০১), বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন?' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

৪.২ দেশের ভেতরের আমলা, রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা হাতিয়ে নিয়েছেন মোট সাহায্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪ হাজার কোটি টাকা । দেশের শহরে ও গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিরা (উচ্চ মধ্যবিত্তসহ) পেয়েছেন ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬,০০০ কোটি টাকা । আর যাদের নামে মূলত: সাহায্য এসেছে ঐ গরীব শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছেন মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫০০০ কোটি টাকা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে, গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের নামে ৪৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৩৫,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ধনস্ফীতির একটি সংগঠিত পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। হতাশা উদ্রেককারী এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করেন বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে হয়ত বা শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত হবে এমন কিছু করা, যাতে করে ভবিষ্যতে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত গরীব শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যটুকুই গ্রহণ করা যায়।

৫.০ অর্থনীতির কয়েকটি ম্যাক্রো চলকের সাম্প্রতিক প্রবণতা

৫.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

৫.১.১. ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জিডিপি বেড়েছে বছরে গড়ে ৩.২ শতাংশ হারে। জনসংখ্যার হার (২.৬%) বাদ দিলে মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র দশমিক ৬ শতাংশের মত। বাংলাদেশ আমলে জিডিপির বৃদ্ধি ঘটেছে তার চেয়ে বেশী হারে, মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসার ফলে) আরও বেশী। ৭০ এর দশকে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.২%, আশির দশকে ৪.৪% , ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে ৪.৫% এবং শেষার্ধে তা ছিল ৫.৫% (সারণী-৭)। ২০০০ সালে তা ৬% পেরিয়ে যায়। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৭০ এর দশকে ১.৪৬ শতাংশ হারে (পাকিস্তান আমলের চেয়ে ২.২ গুন বেশী)। আশির দশকে তা বেড়েছে ২.২% হারে (পাকিস্তান আমলের চেয়ে ৩.৩ গুণ বেশী) আর ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে ৩.৫% এবং শেষার্ধে ৪% এর বেশী (পাকিস্তান আমলের ৯ গুণ এর বেশী) হারে মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বিশেষ করে ভারতের চেয়ে প্রবৃদ্ধির দৌড়ে ৭০ ও ৮০ এর দশকে বাংলাদেশ বেশ পিছনে ছিল। ৯০ এর দশকে এই দুই দেশের প্রবৃদ্ধির হারে পার্থক্য কমতে থাকে এবং শেষ দিকে এসে বাংলাদেশ প্রায় ভারতকে ধরেই ফেলেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় এবং মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির এ সফল উত্তরণ ঘটে । স্বাধীনতা পরবর্তী গত তিন দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাত্রার সঙ্গে গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের বৃদ্ধির মাত্রা (সারণী - ১, ২ ও ৭) বিশ্লেষণ করলে দুটি অর্থনৈতিক ম্যাক্রো চলকের মধ্যে ক্ষীন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তেমন একটা ভূমিকা রেখেছে বলে প্রমাণ মেলে না ।

সারণী-৭
অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো চলকের সাম্প্রতিক প্রবণতা

খাত/উপখাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%), (১৯৯৫/৯৬ স্থির মূল্যে)	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪
জিডিপির তুলনায় শতকরা হার									
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৩.৮৬	১২.৩০	১৩.১০	১৩.১৩	১৪.৯০	১৫.৯০	১৭.৪১	১৭.৭১	১৭.৮৮
জাতীয় সঞ্চয়	১৯.৩০	১৭.৯৬	১৮.৭৯	১৯.১২	২০.১৭	২১.৫৮	২১.৭৭	২২.৩১	২৩.১০
মোট বিনিয়োগ	১৭.৩১	১৭.৯৫	১৮.৪০	১৯.১২	১৯.৯৯	২০.৭২	২১.৬৩	২২.১৯	২৩.০২
সরকারি বিনিয়োগ	৬.৯৭	৬.৪৮	৬.৬৫	৬.৭৪	৬.৪২	৭.০৩	৬.৩৭	৬.৭২	৭.৪১
বেসরকারি বিনিয়োগ	১০.৩৩	১১.৪৭	১১.৭৬	১২.৩৮	১৩.৫৮	১৩.৭০	১৫.২৬	১৫.৪৭	১৫.৬১
আমদানী	১১.২২	১২.৭০	১৩.৩১	১৫.৫০	১৬.৯০	১৬.৯৩	১৭.০৯	১৭.৫৪	১৭.৮৩
রপ্তানী	৬.৩৭	৭.৪১	৮.০৫	৯.২১	৯.৫৫	১০.৪৮	১১.৭৬	১১.৬৫	১২.২৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৫.২ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন দেশের জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণ অত্যাবশ্যক। এই বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরনের প্রধান দুইটি উৎসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বা জাতীয় সঞ্চয় হচ্ছে একটি উৎস। বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়-এর পর বেশ অনেক বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এর হার কাংখিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় অর্জন করতে পারেনি বলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশকে অধিক মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে বলে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন । সাম্প্রতিক কালে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এর হার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১/৯২ সালে সঞ্চয় এর হার যেখানে ছিল ১৩.৮৬ সেখানে ১৯৯৯/০০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৭.৮৮। আর অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক (Savings–Investment Gap) পূরণের জন্য কম মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করলেও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

৫.৩ আমদানী ও রপ্তানী

৫.৩.১ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণে অন্য একটি উৎস হচ্ছে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (রপ্তানী আয়-আমদানী ব্যয়)। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সকল সময়ে আমদানীর হার রপ্তানী আয়ের উপরে অবস্থান করেছে । যদিও সাম্প্রতিক কালে রপ্তানী বৃদ্ধির হার আমদানী বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে তথাপিও আমদানী ব্যয় সকল সময়ে রপ্তানী ব্যয়ের উপরে অবস্থান করেছে।

সুতরাং আমদানী-রপ্তানী ফাঁক (Export–Import Gap) পূরণের জন্য হলেও বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক এবং আমদানি-রপ্তানি ফাঁক পূরণের জন্যই দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি । পরিকল্পনাসমূহে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের কাম্য বরাদ্দ (optimum allocation) এবং এর পূর্ণ ব্যবহার (full utilisation) না হওয়ার কারণেও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে পারে । বাংলাদেশে সম্পদের বরাদ্দ সব সময় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ ছিল - এটা যেমন বলা যাবে না, তেমনি এও বলা যাবে না যে, বাংলাদেশে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সবসময় কাঙ্খিত মাত্রায় হয়েছে । তাছাড়া সম্পদের কাম্য বরাদ্দ হলেই যে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে - এমন বলা যাবে না। সম্পদ ব্যবহারের সংগে যে সকল মানুষ জড়িত তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও সততার উপর সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া নির্ভর করে । বাস্তবিক পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক এবং পূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশিত মাত্রায় হলে হয়তো বা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হতো না ।

৫.৪ দারিদ্র পরিস্থিতি

৫.৪.১ ৯০ এর দশকে দারিদ্র নিরসনে সামান্য হলেও বাংলাদেশ ইতিবাচক অবদান রেখেছে । ৯০ এর শেষার্ধে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র কমেছে (সারণী-৮)। ৯০ এর দশকের শেষার্ধে দারিদ্র যে কমেছে তার প্রমাণ মেলে গ্রাম বাংলায় প্রকৃত কৃষি মজুরীর পরিবর্তন থেকে। ৯০ সালে কৃষক গড়ে যে মজুরী পেত তা দিয়ে ৪.১৮ কেজি চাল কিনতে পারত । আর ২০০০ সালে ঐ মজুরী দিয়ে ৫.১১ কেজি চাল কেনা সম্ভব হয়েছে । জিনিসপত্রের দাম তেমন বাড়েনি বলে ক্ষেত মজুরদের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। পাশাপাশি পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণও তাদের বেড়েছে। তবে এই হারে দারিদ্র কমলে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আরও বহুবছর লেগে যাবে। এই দারিদ্র মূলতঃ আয়ের অভাব থেকে উৎপন্ন।

সারণী-৮

সাম্প্রতিক দারিদ্র পরিস্থিতিঃ মাথা গণনা অনুপাত (%)

	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
জাতীয়	৪৭.০	৪৬.০	৪৬.৭	৪৪.৭
পল্লী	৪৭.৯	৪৬.৮	৪৭.৬	৪৪.৯
শহর	৪৪.৪	৪৩.৪	৪৪.৩	৪৩.৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১০৭ ।

৫.৪.২ বাংলাদেশ আয়-দারিদ্র নিরসনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় মাপের সাফল্য দেখাতে না পারলেও মানবিক দারিদ্রের নিরসনে তুলনামূলক ভাবে ভাল করেছে। স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৯০ এর দশকে বিশেষ করে শেষার্ধে খুবই ভাল

করেছে। শিশু মৃত্যুর হার ৮০ এর দশকের শেষার্ধে ছিল প্রতি হাজারে ১০৫ । ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে তা কমে দাড়ায় ৮১ তে এবং শেষার্ধে তা আরও কমে দাড়ায় ৫১ এ । মায়েদের মৃত্যুর হারেও অনুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। শিশুদের পুষ্টি ক্ষেত্রেও একই রকমের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় । ৯০ এর দশকের শেষার্ধে বিশেষ করে এই অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ওজন সূচকে বড় মাপের উন্নতি ঘটেছে এই সময়ে। তবে লিঙ্গভেদে এই অগ্রগতি ভারসম্যপূর্ণ ছিলনা। অঞ্চলভেদেও পার্থক্য লক্ষণীয় । স্বাস্থ্য খাতে সরকারি খরচও এই দশকে বেড়েছে । কিন্তু স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়েনি । শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই দশা । সংখ্যাগত উন্নতি হয়েছে কিন্ত মান বাড়েনি । ১৯৯১ সালে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিল ৩৯% । ২০০০ সালে এই হার ৬৪% এর উপরে উঠে গেছে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১৯৯১ সালে ছিল ৭৬% । ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৭% । এই ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার বেশী । তবে শিক্ষার মান ছিল খুবই খারাপ । আয় বহির্ভূত দারিদ্রের নিরসন তুলনামূলকভাবে ভাল হওয়ার কারণে আমরা জাতিসংঘ উদ্ভাবিত মানব উন্নয়ন সূচকে কিছুটা ভাল অবস্থানে পৌচেছি । মানব উন্নয়ন সূচক বেড়েছে সামাজিক খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রাম বাংলার এনজিওসহ নানাবিধ উন্নয়ন তৎপরতার কারণে । খুব স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল যে, এর প্রভাব নিশ্চয়ই গরীব মানুষের আয় উন্নতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে । খানিকটা সহায়তা নিশ্চয় করেছে । তবে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারেনি ।

৫.৪.৩ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, একদিকে আয়ের বৈষম্য বেড়ে গেছে অন্যদিকে সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ততটা উন্নত হয়নি । কৃষির প্রবৃদ্ধি না ঘটলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হত । তবে গবাদি পশু ও মাছ খাতের উন্নতির ফলে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি কৃষিতে লক্ষ্য করা গেছে তার সিংহ ভাগই ধনী কৃষকদের ঘরে উঠেছে । গরীবরা এর সুফল তেমন পায়নি । তবে কৃষির প্রবদ্ধির কারণে কম দামে চাউল কিনতে পেরে গরীব মানুষের কোনমতে বেচে থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে গরীব লাভবান হলেও দরিদ্রতম অংশ তেমন উপকৃত হয়নি । তাছাড়া, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধি তেমন হারে ঘটেনি বলে চাকুরীর সুযোগ বাড়েনি । চোরাচালানের কারণেও শিল্পায়নে গতি আসতে পারেনি । ফলে প্রচুর বেকার যুবককে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হতে দেখা যাচ্ছে ।

৫.৪.৪ এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, এত বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিওদের এতসব কর্মকান্ড (যা প্রায় পুরোটাই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট) সত্বেও দারিদ্র নিরসনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে ঘটছে না কেন । মূলতঃ সরকার ও এনজিওদের কাজের সমন্বয়, সহযোগিতা এবং সুশাসনের অভাবের কারণে এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেকেই মনে করেন । যার যেখানে দক্ষতা সেখানে যদি সে বা তারা বেশী বেশী কাজ করত তাহলে দারিদ্র্য নিরসনে আরো খানিকটা সাফল্য

অর্জন করতে পারত। যেমন সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন (বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাট, আইটি ব্যাকবোন, যোগাযোগ), শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মানবপুজি উন্নয়নে বেশী মনোযোগী হলে বেসরকারি খাত তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরো পারদর্শিতা দেখাতে পারতো । কোন একটি এলাকায় সরকার যদি ভাল রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়ায় তাহলে সে এলাকার ব্যক্তিখাত মিল, ফ্যাক্টরী স্থাপন করে স্থানীয় বাজারের প্রসার ঘটাতে পারে এবং সেখানে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডের প্রভাবে দারিদ্র্য নিরসনের মাত্রা না বেড়েই পারেনা । এভাবে সকলের কাজে এক ধরনের সিনার্জি বা সমন্বিত সংযোগ ঘটতে পারে । বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের এত অর্থ বরাদ্দ সত্বেও সে ধরনের সিনার্জি ঘটেনি এবং সে কারণেই দারিদ্র্য নিরসনে তেমন গতি আসেনি । এজন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ দাতা গোষ্ঠী সরকারকে দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়নে চাপ দিচ্ছে । অতিসম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত দাতা সংস্থাদের উন্নয়ন সভায় দারিদ্র্য নিরসন ও সুশাসন নিয়েই বেশী আলাপ আলোচনা হয়েছে ।

৬.০ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য আসলে কতখানি প্রয়োজন

৬.১ বাংলাদেশে গত প্রায় ত্রিশ বছরে সরকারি খাতে যে ১৮০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এসেছে সেটা বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে খুব একটা ত্বরান্বিত করতে পারেনি বলেই উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য খুব একটা ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়না । দেশে সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করতেও বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য খুব একটা ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়না । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ঐ ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা কতখানি সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ । উন্নয়ন বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লক্ষ্য নয় - উপলক্ষ মাত্র । শুধু তাই নয় বৈদেশিক ঋণ সাহায্য তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বকীয়, সার্বভৌম আর্থ সামাজিক কাঠামো সৃষ্টিতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ।

৬.২ গত ত্রিশ বছরে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে সেটা দাতা গোষ্ঠীর স্বার্থেই ঘটেছে । দাতা গোষ্ঠির স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থেই উত্তরোত্তর অধিকতর অগ্রাধিকার পেয়েছে শর্ত বন্ধনযোগ্য প্রকল্প ঋণ । দাতা গোষ্ঠী উত্তরোত্তর অধিক হারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সরাসরি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । ফরেন এইড নামক বিষয়টি একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশজ এলিট শ্রেণীর জীবন যাত্রা, মানমর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী করণে সহায়তা করেছে । ফলে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে; যার স্থায়ী করণে দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে রাজনীতি ।

৬.৩ এমতাবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা বিবেচনা করতে পারি তাহলো প্রতিকূল শর্তের সকল ঋণ সাহায্য বর্জন করা । বিষয়টি শুধুমাত্র জরুরীই নয়, সেই সাথে সম্ভবও বটে।

প্রথমতঃ আমাদের দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিদেশী ঋণ সাহায্যের সাথে সহ সম্পর্কিত নয় । ১৯৯০ পরবর্তি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমেছে । কিন্ত প্রবৃদ্ধি কম মাত্রায় হলেও ক্রমশঃ বেড়েছে। অপরদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ৯০-এর দশক পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে কিন্তু তখন প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশী বাড়েনি । দ্বিতীয়তঃ মোট জিডিপির অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অবদান ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে । ১৯৮০-৮১ তে এই অবদান ছিল জিডিপির ১০% আর এখন জিডিপির ৪% । তাছাড়া জিডিপিতে কিছু অমূল্যায়িত দ্রব্য-সামগ্রী থাকে (যেমন বাজার সম্পর্কের আওতা বহির্ভূত উৎপাদন কার্যক্রম ও কালো অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম) যেগুলো হিসাব করলে বর্তমানে জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য হবে সর্বোচ্চ ২%, যা বর্জন করলে অর্থনীতির কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই ।

৬.৪ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আর যা বিবেচনা করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অনুকূল শর্তে ঋণ সাহায্য প্রাপ্তির উৎস অনুসন্ধান করা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি করার জন্য সম্ভাব্য সকল বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া । এছাড়া বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

৭.০ উপসংহার

৭.১ যদি কোন দেশ বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নয়ন না করতে পারে তবে কি বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন সম্ভব? উন্নয়ন মূলত একটি স্বউদ্যোগী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশজাত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সাথে সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নও সংঘটিত হয় । বৈদেশিক সাহায্য এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শুরু করতে পারে না । কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি শুরু হলে, তাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে । তবে বৈদেশিক সাহায্য কী জন্য নেয়া হবে, কার জন্য নেয়া হবে এবং কতদিন পর্যন্ত নেয়া হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে ।

৭.২ বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের আর্থিক সম্পদ বাড়ায় । এই সম্পদ দেশের প্রকৃত সম্পদ (Real Resources) এবং উৎপাদন বাড়াবে কি না, সেটা নির্ভর করে নিম্নোল্লিখিত বিষয়ের উপর ঃ

১। আইনের শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,
২। প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি,
৩। যান্ত্রিক ও তথ্যগত কাঠামোর উন্নয়ন এবং
৪। মানব শক্তির উন্নয়নের পর্যায় ।

৭.৩ বাংলাদেশের গত ত্রিশ বছরের বৈদেশিক সাহায্যের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেদের আস্থা

এবং জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধ গত তিন দশকে অনেক হ্রাস পেয়েছে । এর ফলে আমরা নিজেদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে আবিস্কার করতে পারছি না । জাতির সামনে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা থাকতে হবে । দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টার ভূমিকা পালন করতে পারে না । আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উজ্জীবিত করে আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে । কল কারখানা চালু না করে, উৎপাদন না বাড়িয়ে, বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে শুধু বিলাসবহুল গাড়ী আমদানী করে, অফিসের সাজ-সরঞ্জাম, ভোগ বিলাস ইত্যাদি অব্যাহত রেখে অনুদান পেয়েও কোন লাভ হবে না । বৈদেশিক অনুদান ও সাহায্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন । ভোগ নয়, বিলাসিতা নয়, উৎপাদনকেই করতে হবে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000, Flow of External Resources into Bangladesh, Economic Relations Division, Ministry of Finance, Dhaka.

Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000, Mid-Term Review of the Fifth Five Year Plan, 1997-2002, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.

Sobhan, Rehman and Islam,T. 1988. "Foreign Aid and Domestic Resource Mobilization in Bangladesh", The Bangladesh Development Studies, Vol.XVI. No.2.

Sobhan, Rehman, 1990. From Aid Dependence to Self–Reliance: Development Options for Bangladesh, Dhaka : University Press Limited.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১ম - ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

বারকাত, আবুল (২০০১), "বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন? শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ।